গত শতাব্দীর তিরিশ দশকে যে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক মন্দা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মহামারির আকারে পৃথিবীর সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল জন মেনার্ড কেইন্‌স্ - এর জেনারেল থিয়োরি অফএমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এ্যাক্‌স মানি। সেই কালজয়ী সন্দর্ভে কেইন্‌স্ দেখিয়েছিলেন, অনিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মাঝে - মধ্যে জিনিসপত্রের চাহিদা ভীষণরকম কমে যেতে পারে এবং সেই কারণে তৈরি হতে পারে ভয়াবহ সংকট। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় কৃত্রিমভাবে কর্মসংস্থান তৈরি করা, জোর করে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ানো। কেইন্‌স্ মনে করেছিলেন চাহিদা বাড়ানোরকাজটা রাষ্ট্রই সব থেকে ভাল করতে পারবে। রাষ্ট্র নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করলে, নতুন রাস্তাঘাট তৈরি করলে, বাঁধ বা সেচ নির্মাণকরলে, দৈত্যাকার পাওয়ার প্লান্ট বসালে, একদিকে ইট - কাঠ - লোহা - সিমেন্টের চাহিদা যেমন বাড়বে তেমনি অন্যদিকে বেকাররা কাজ পাবে। যারা নতুন কাজ পেল তারা আবার তাদের আয়ের একটা অংশ বাজারে খরচ করলে আরও নানারকমের জিনিসের চাহিদা বাড়বে, ফলে কারখানার চাকা আবার ঘুরতে শুরু করবে, আররও কর্মসংস্থান ঘটবে।

সেই তিরিশ দশকের মন্দা ভারাক্রান্ত পশ্চিমি দুনিয়ায় কেইন্‌স্ দেখা দিয়েছিলেন ধনতন্ত্রের পরিত্রাতার ভূমিকা আর তাঁর কথা বেদবাক্য বলে গৃহীত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিপুলভাবে গ্রাহ্য মনে হয়েছিল যে অনিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক আর্থ - সামাজিক ব্যবস্থায় মাঝে - মাঝেই মহাসংকট আসতে পারে এবং সেই মহাসংকটের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র রাষ্ট্র। একটু অন্যভাবে বলতে গেলে, সেই সংকটের সময় এটা চরম ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও মেনে নেওয়া হয়েছিল যে একটা দেশের আর্থিক উন্নতির নেপথ্যে ব্যক্তিমানুষ বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের যত বড় ভূমিকাই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে সে উদ্যোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার অসম্ভব। এমন অনেক কাজ আছে যা ব্যক্তি একা - একা পারে না, কিন্তু যৌথভাবে পারে। আর রাষ্ট্র তো ব্যক্তিরই যৌথ সত্ত্বা, তাই তাকে বাদ দিয়ে আর্থিক উন্নতি ঘটবে কেমন করে?

সেই অস্থির তিরিশ দশকে মন্দার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কেনসীয় দাওয়াই মেনে অনেক নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হল, নতুন পাওয়ার প্লান্ট বসল, দৈত্যাকৃতি বাঁধ নির্মিত হল। কিন্তু সেই নতুন নীতি দেশকে আর্থিক মন্দার গহ্বর থেকে টেনে তোলারকাজে কতটা সফল হল বলা শক্ত কারণ সব রকম সরকারি প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, জনহিতকর প্রকল্পে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করা সত্ত্বেও,কর্মসংস্থান তেমন একটা বাড়ল না, দেশে আর্থিক লেনদেন প্রায় আগের মতই রইল। বস্তুত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে পযন্ত পশ্চিমের অর্থনীতি একই অবস্থায় রইল। যুদ্ধ শুরু হবার পর একটু একটু করে অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য যুদ্ধ - সামগ্রীর যে বিপুল চাহিদা বাড়াতে লাগল, অনেকেই মনে করেন, পশ্চিমী অর্থনীতির পুনরুত্থানের গোড়াপত্তন সেখান থেকেই।

কেনসীয় নীতি বাস্তবে কাজ করুক বা না করুক, নীতি - নির্ধারকদের কাছে তার কদর কিছু কিছুমাত্র কমল না। যুদ্ধ শেষ হবার পর আরও তিরিশ - পঁয়ত্রিশ বছর দাপটে রাজত্ব করেছিল কেনসীয় অর্থনীতি। যার অর্থ, ধনতান্ত্রিক পৃথিবী জুড়ে নীতি - নির্ধারকদের মনে রাষ্ট্রের ভূমিকা কায়েম রইল। এর পাশাপাশি লোহার পর্দার আড়ালে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল সোভিয়েত রাশিয়া। ভারি ভারি কলকারখানা বসাচ্ছিল, মহাকাশে পাঠাচ্ছিল স্পুটনিক, পৃথিবীর মানুষকে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দুঃখী মানুষকে নতুন একটা সমাজের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল যেখানে রাষ্ট্র এক মহাত্রাতার ভূমিকা অবতীর্ণ হয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেবে। একই সঙ্গে একটা ভিন্নতর সামাজিক নিরীক্ষা নিয়ে উপস্থিত চিনও অনেক মানুষের কল্পনাকে উসকে দিচ্ছিল। সব মিলিয়ে কেনস থেকে শুরু করে মাও সে তুঙ অব্দি বিস্তৃত নানা ধরনের মৃদু, তীব্র বা তীব্রতর বামপন্থী বিশ্বাস, মতাদর্শ কথাটাতে আপত্তি না থাকলে তাই-ই, তিরিশ থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল সারা পৃথিবীটাকে।

আমাদের দেশ কিংবা শহর এর কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। সত্তর দশকের গোড়ায় আমরা যখন ইস্কুলের চৌকাঠ পেরিয়েকলেজে ঢুকেছি, তখন শহরের দেয়ালে - দেয়ালে স্টেনসিল কাটা চিনের চেয়ারম্যানের টুপি পরা প্রতিকৃতি রোদ - বৃষ্টি - ঝড়ে ঝাপসা হয়ে এসেছে। তার পাশে জ্বলজ্বল করছে এশিয়ার নতুন মুক্তিসূর্যের ছবি। সদ্য শেষ হয়েছে বাংলাদেশ যুদ্ধ, কংগ্রেসিদের মনোবলতুঙ্গে। তারই জেরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভিতরে ও বাইরে নিত্য নতুন কাজিয়া লেখা থাকে। বন্দেমাতরম ধ্বনি সহযোগে নিয়মিত নকশালপন্থীদের ধোলাই হয় ঠিক যেমন পাঁচ বছর আগে ওই একই জায়গায় বিপ্লবের স্লোগান দিয়ে বন্দেমাতরমওয়ালাদের ধোলাইকরা হত। পাঁচ বছরের মধ্যে যুযুধান দুটি দল তাদের ভূমিকাগুলো বদলা - বদলি করে নিয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাল এটাততটা আশ্চর্যের নয়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কতই তো ঘটে থাকে। আসল আশ্চর্য এটাই যে আজকের নিরিখে সেদিনের সেই যুদ্ধরতদুটিপন্থাকেই অনায়াসে বামপন্থী বলা চলে। নকশালপন্থীরা তো গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানা দোকানপাট সমতে গোটা বাজারঅর্থনীতিটাকেই লোপাট করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এশিয়ার নব মুক্তিসূর্যটিও ততদিনে এমনকি রুটি তৈরির কারখানা পর্যন্ত সব কিছু রাষ্ট্রের কবলে নিয়ে এসেছেন। সেই সমাজতন্ত্র জমানায় প্রায় সকলেই ছিল বামপন্থী, কেউ বেশি কেউ বা একটু কম। সেমিনারে -বক্তৃতায় বেশি কমদের সংস্কারপন্থী বলে গাল পাড়ত। আর যে দুচারজন দক্ষিণপন্থী আড়ালে আবডালে থাকত, জনসমক্ষেতাদের গলার আওয়াজ খুব বেশি শোনা যেত না। পাড়ার চায়ের দোকান খুঁজলে তখনও এমন কাউকে পাওয়া যেত যিনি বিশ্বাস করতেন আমাদের দেশে একদিন না একদিন বিপ্লব আসবেই, অনেকটা নেতাজী ফিরে আসার মত।

।।দুই।।

বস্তুত, ষাট-সত্তর দশকথেকেই রাষ্ট্রের হাতে পড়ে সারা পৃথিবীতে অর্থনীতির অধোগমন শুরু হয়। অর্থনীতি চাঙ্গা করবার একটা কেনসীয় সালসা ছিল অতিরিক্ত টাকা ছাপিয়ে রাষ্ট্রের খরচ বাড়ানো। আশা করা হত এর ফলে দেশের মধ্যে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়বে। পৃথিবীর কোনও কোনও দেশে, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে এই কেনসীয় দাওয়াই - এর অতিপ্রয়োগের ফলেনানারকম দুর্লক্ষণ দেখা দিল। তার মধ্যে প্রধানতম হল অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি। একদিকে রাষ্ট্রের লাগাম ছাড়া খরচ এবং সেই খরচ করবার জন্য বেপরোয়াভাবে নতুন টাকা ছাপানো, অন্যদিকে জিনিপত্রের জোগান, অন্তত কিছু কিছু জিনিসপত্রের জোগান, সেরকভাবেনা বাড়া, এই দুই মিলিয়ে দেখা গেল এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে যেখানে গাদা গাদা নগদ টাকা হাতে গোনা কয়েকটা জিনিসের পিছনে ছুটছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল, বলাই বাহুল্য, মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি।

এই মূল্যবৃদ্ধি অন্তত তিনভাগে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান কমিয়ে দিচ্ছিল। প্রথমত, যে জিনিসপত্র ও পরিষেবা স্বাভাবিক অবস্থায়, সাধারণ নাগরিকদের ভোগে লাগতে পারত সেগুলো চলে যাচ্ছিল সরকারের দখলে। সরকারের দখলে গিয়ে সেগুলো বিশেষ কয়েকটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর কাজে লাগছিল। দ্বিতীয়ত, একটানা মূল্যবৃদ্ধির ফলে টাকার অঙ্কে বেড়ে যাচ্ছিল মজুরি ও বেতন, কিন্তু জিনিসপত্রের দানের তুলনায় তা মোটেই বাড়ছিল না, উল্টেক্রমশই কমে যাচ্ছিল। লক্ষণীয় যে, মজুরির প্রকৃত মূল্য না বাড়লেও যেহেতু টাকার অঙ্কে তার মূল্য বাড়ছিল, সাধারণ মানুষকে ক্রমশই বেশি হারে আয়কর দিতে হচ্ছিল যেহেতু আয়করের হার টাকার অঙ্কে আয়ের উপর নির্ভরশীল। এর ফলে দ্বিগুণভাবে বেড়ে যাচ্ছিল মানুষের দুঃখ - দুর্দশা। তৃতীয়ত, মূল্যবৃদ্ধির সময়ে সাধারণভাবে উত্তমার্ণের ক্ষতি এবং অধমর্ণের লাভ হয়ে থাকে। অতএব সরকারি বণ্ডে যেসব সাধারণ মানুষ টাকা রাখছিল, মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাদের হচ্ছিল ক্ষতি আর সরকারের লাভ।

ক্রমে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোয় এতটাই মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে শুরু করল যে টালমাটাল হয়ে গেল পুরো অর্থনীতি। কোনও কোনও দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার বছরে এক হাজার শতাংশ ছাড়িয়ে গেল। সাধারণ মানুষ দেশের মুদ্রা ছেড়ে মার্কিন ডলারে তাদের অর্জিত সম্পদ রাখতে শুরু করল। এবং এই সব কিছুর পিছনে ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন কেনসীয় দাবাই-এর ব্যবহার।

একই সঙ্গে সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রটিপূর্ণ দিকগুলো একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। সে দেশে সমাজতন্ত্রের বদলে একটা ভয়ানক আমলাতন্ত্র কায়েম হয়ে বসছিল। সেখানে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হত একেবারে ওপরতলা থেকে। ফলে তৃণমূল স্তরের প্রয়োজনগুলোর প্রতি মনোযোগের বিশেষ অভাব ঘটছিল। সব থেকে বড় কথা, যে মৌলিকবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সমাজতন্ত্রের কল্পনা করা হয়েছিল সেই বিশ্বাসটাতেই যেন একটু একটু করে চিড় ধরছিল। সমাজতন্ত্রকল্পনার মূল এই বিশ্বাস অবশ্যই ছিল যে মানুষকে বদলানো যায়, তার সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতাকে বদলে দিয়ে সহমর্মিতায় রূপান্তরিত করা যায়। এই মৌলিক বিশ্বাসের যথার্থতা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে দুই ভাবে সন্দেহ দেখা দিল। একদিকে পার্টির হোমরা - চোমরারা, যাঁদের হাতে সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত হয়েছিল, বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাপৃত হলেন। সমাজের বৃহদংশের

ভালোমন্দ নিয়ে তাঁদের খুব একটা মাথা - ব্যথা দেখা গেল না। অন্যদিকে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন কাজকর্মে আর্থিক উৎসাহের অভাব, বোধ করেছিলেন। দক্ষতা অনুযায়ী মজুরির বদলে প্রয়োজন অনুযায়ী মজুরির নীতি শেষ পর্যন্ত ধোপেটিকল না। যাঁরা দক্ষ ও কর্মক্ষম তাঁরা দেখলেন কাজ করলে যত টাকা মাইনে পাওয়া যাবে, কাজ না করলেও ঠিক তত টাকাই পাওয়াযাবে। তাহলে কাজ করার কষ্টটুকু স্বীকার করা কেন ? অর্থাৎ মুড়ি-মিছরির একদর হওয়ার ফলে সমাজে অদক্ষতা বাড়তে লাগল, কাজে উৎসাহের অভাব ঘটতে লাগল।

সোভিয়েত অর্থনীতির পতন এবং পৃথিবী জুড়ে বাজার অর্থনীতির পুনরুত্থান প্রায় একই সঙ্গে ঘটেছিল। এশিয়ান টাইগারবলে খ্যাত চারটি দেশ - দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ও সিঙ্গাপুর) বাজার অর্থনীতির মধ্যবর্তিতায় দ্রুত উন্নতি করেছিল এবংকমিউনিস্ট চিনও বদলে যাচ্ছিল একটু একটু করে। তাদের আর্থিক নীতি ও মতাদর্শ পাল্টে ফেলে চিনারা যেভাবে সারা পৃথিবীর বাজারে প্রবেশ করেছিল তা এককথায় অভূতপূর্ব। সব মিলিয়ে ধনতন্ত্রের প্রশংসা ও সমাজতন্ত্রের নিন্দা ছড়িয়ে পড়ছিল সারা পৃথিবী জুড়ে। পৃথিবীর মানুষের মতাদর্শ একটু একটু করে দক্ষিণে হেলে পড়ছিল।

আমাদের দেশে আর্থিক নীতি বদলাতে শুরু করেছিল আশির দশকের মাঝামাঝি, রাজীব গান্ধীর আমলে। সেই প্রথম আমদানি নীতি শিথিল হল, পঞ্চাশ দশকের মোটরগাড়ির মডেলের পাশাপাশি আধুনিক গাড়ির প্রাদুর্ভাব ঘটল, টেলিকম শিল্পের বিপ্লবের সূচনা হল। সম্ভবত হঠাৎ আমদানি নীতি শিথিল হওয়ার ফলে এবং সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি না বাড়ার ফলে নব্বই দশকের গোড়ায় আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে একটা মারাত্মক সংকট দেখা দিল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে আর মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের মত তেল কেনার বিদেশি মুদ্রা ভাণ্ডারে অবশিষ্ট রয়েছে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ল। ঋণের সঙ্গে সঙ্গে এল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আরোপিত শর্তাবলী। সেই শর্ত মানতে গিয়েই একেবারে পুরোপুরি বাজার অর্থনীতির ভিতরে ঢুকে গেল আমাদের দেশ।

ঋণের সঙ্গে তিনটি প্রধান শর্ত আরোপ করেছিল আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার। প্রথম শর্ত, বাজারের চাহিদা - জোগান মেনে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটাতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, বিদেশি পণ্য এবং বিনিয়োগ আমদানি অবাধ করবার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরজা খুলে দিতে হবে। তৃতীয় শর্ত, দেশের ভিতরে যতটা সম্ভব বেসরকারি উদ্যোগের বিকাশ ঘটাতে হবে এবং অদক্ষ সরকারি সংস্থাগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দিতে হবে। ভিতরে ভিতরে বাজার অর্থনীতির তাগিদ থাকলেও, অন্তত উপর উপর আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য ছিল ঋণ দেওয়া টাকা সময় মত ফেরত পাওয়া। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার মনে করত একটি দেশ এই শর্তগুলি মানলে ঋণ ফেরত দেওয়া সহজ হবে।

প্রথমত, সেই সময় টাকার নিয়ন্ত্রিত দাম তার প্রকৃত দামের অনেক উপরে ধরে রাখা হয়েছিল। ফলে বিশ্বের বাজারে ভারতীয় রপ্তানির দাম ছিল অস্বাভাবিক রকমের বেশি। একই সঙ্গে আমদানির দাম ছিল কম। দুটো মিলিয়ে আমদানি বেশি হচ্ছিল, রপ্তানি কম। এর ফলে আবার দেশের ভাণ্ডারে বিদেশি মুদ্রা খুব একটা জমছিল না। টাকার অবমূল্যায়নের ফলে আমদানির দাম বাড়ল, রপ্তানির দাম কমল। আশা করা হল, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারে এবার যথেষ্ট জমবে এবং বিদেশি ঋণ ফেরত দিতে সমস্যা হবে না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শর্ত মেনে বিশ্বায়ন ও বেসরকারিকরণ করলে, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বলল, দেশে দক্ষতা বাড়বে, আয় ও উৎপাদন বাড়বে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, ফলে ঋণ শোধ দিতে অসুবিধে হবে না।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের ঋণ ভারত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই শোধ দিতে পেরেছিল। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হল, বিশ্বায়নের যে প্রক্রিয়াটি আমাদের দেশে ঋণের শর্ত মানতে গিয়ে শুরু করা হয়েছিল, সেটি এখনও চালু আছে। এবং দেড় দশক ব্যাপী এই বিশ্বায়নের ফলে আমাদের অর্থনীতিতে যে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। মাথাপিছু গড় আয় বাড়ছে, রপ্তানি বাড়ছে, বিনিয়োগ বাড়ছে। বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারটি তো বিশেষভাবে ফুলে - ফেঁপে উঠেছে। তবু বিশ্বায়ন সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।

।।তিন।।

এক আশ্চর্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন চলেছি। শহরের ভিতরে ও প্রান্তে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন শহর। প্রাচীন ঘরবাড়ি ভেঙে গড়ে উঠছে হাইরাইজ, হেল্‌থ্‌ ক্লাব, সাঁতারের নীল জলাশয়। সনাতন মুদির জায়গায় পাঁচতলা সুপার মার্কেট গজিয়ে উঠছে, পুরনো থিয়েটার পাড়ার বদলে মাল্টিপ্লে'। ময়াল সাপের মত যে ফ্লাইওভারগুলো পুরনো শহরটাকে একটু একটু করে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলবার উপক্রম করছে তার উপর দিয়ে টয়োটা-হুযা-শেভ্রোলে হাঁকিয়ে চলতে চলতে এখন মনে হতেই পারে পশ্চিমের কোনও দেশে এসে পড়েছি।

এই ঐকতানে সঙ্গত করছে অর্থনীতির নানা পরিসংখ্যান। পরিসংখ্যান বলছে, গত ষাট ও সত্তর দশকে, যখন সারা পৃথিবীর আয় গড়ে পাঁচ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন ভারতীয় আয়বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র সাড়ে তিন শতাংশ। মনে রাখতে হবে, ওই সময় ভারতের জনসংখ্যা দুই শতাংশেরও বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে সমস্ত ষাট - সত্তর দশক জুড়ে ভারতের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দুই শতাংশও ছাড়াতে পারেনি। এখন চাকা ঘুরে গেছে। সারা পৃথিবীর গড় আয়বৃদ্ধির হার মেমে এসেছে তিন শতাংশের নীচে। একই সঙ্গে আশির দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ভারতের আয়বৃদ্ধির হার গড়ে পাঁচ-ছয় শতাংশে পৌঁছে গেছে। পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খানিকটা কমে যাবার ফলে গত কুড়ি-পঁচিশ বছর যাবৎ ভারতের মাথাপিছু আয় গড়ে চার শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লক্ষ করবার ব্যাপার হল, এই বৃদ্ধিহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আশির দশকে আয়ের যে বৃদ্ধিহার ছিল, নব্বই দশকের গড়বৃদ্ধিহার হল তার থেকে বেশি। নতুন শতাব্দীতে এসে এই হার আরও বেড়েছে। এর মধ্যে, বলাই বাহুল্য, ওঠা - পড়া ছিল। কিন্তু বৃদ্ধিহারের দীর্ঘমেয়াদি ধারাটি যে ঊর্ধগামী তাতে সন্দেহ নেই। এর সঙ্গে আরও কিছু কিছু সুলক্ষণ এখন দেখা যাচ্ছে। যে মুদ্রাস্ফীতিরদানব একদা দাপিয়ে বেড়াত, মনে হচ্ছে অবশেষে তাকে কব্জা করা গেছে। বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের মুদ্রাস্ফীতির হার পাঁচ- ছয় শতাংশের নীচে আটকে রয়েছে। একই সঙ্গে আমাদের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার, আগেই বলেছি, যা নব্বই দশকের গোড়াতেও নেহাত ক্ষীণকায় ছিল, অধুনা ফুলেফেঁপে উঠেছে। তাছাড়া বিদেশি বিনিয়োগ হু হু করে বাড়ছে, বাড়ছে জাতীয় সঞ্চয় ও দিশি বিনিযোগের অনুপাতও। সব মিলিয়ে এমন মনে হওয়াটা বিচিত্র নয় যে ক্রমশ এক অভূতপূর্ব সুসময়ের দিকে আমরা যাত্রা করছি এবং এই যাত্রার পিছনে মূল চালিকাশক্তি হল বিশ্বায়ণ।

কিন্তু সত্যিই কি আমরা এই সময়কে সুসময় বলতে পারি ? বস্তুত, শুধুমাত্র আয়বৃদ্ধির হার বেড়েছে বলেই দেশের প্রভূতউন্নতি ঘটে গেছে এমন মনে করার মত ভুল আর হয় না। আয়বৃদ্ধির ফলে সামান্য কিছু মানুষের উন্নতি অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগের অবস্থাই রয়ে গেছে আগের মতো। এইরকম একটা একপেশে বৃদ্ধিকে আমরা কেন উন্নতি বলব ? বোঝা দরকার, শুধুমাত্র আর্থিক বৃদ্ধিহার থেকে উন্নতি বোঝা যায় না, আর্থিক বৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষের মধ্যে কতটা ছড়িয়ে পড়ল তার উপর নির্ভর করে একটা আর্থ -সামাজিক পরিবর্তনকে সত্যিকারের উন্নতি বলা যাবে কিনা।

বস্তুত একটু চোখ মেলে তাকালেই বোঝা যাবে বিশ্বায়নের স্বর্ণরথ এখন অব্দি সকলকে জায়গা দিতে পারেনি। মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকও সেই কথা জানাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, এখন ৬০ শতাংশেরও বেশি ভারতীয় নিরাপদ পানীয় জল পান না, ৪০ শতাংশের ঘরে বিদ্যুতের যোগাযোগ নেই, ৫০ শতাংশের নেই শৌচাগারের সুবিধা, পাকা বাড়ি আছে এমন মানুষের অনুপাত গ্রামে ৩০ শতাংশেরও কম, প্রতি হাজারে এখনও ৭৭টি শিশুর জন্মকালেই মৃত্যু হয়।

এটা বোঝবার জন্য গভীর ধীশক্তির প্রয়োজন হয় না, বিশ্বয়ন ও বাজার অর্থনীতি তার নিজের নিয়মে চললে এই বিপুল সংখ্যক গরিব মানুষের সমস্যার কোনও সুরাহা হবে না। এদের জন্য আলাদা করে কিছু করা দরকার। শুধুমাত্র সাম্যের কথা ভেবেই যে কিছু করা দরকার তাই নয়, বাজার অর্থনীতির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে গেলেও গরিব মানুষদের কথা ভাবা দরকার। কারণ আমাদের দেশে, যতই দোষযুক্ত হোক, একটা গণতন্ত্র আছে। শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন যদি বাজার অর্থনীতি থেকে ক্রমাগত নিজেদের উন্নতি ঘটাতে থাকে আর সংখ্যাগুরু বাকি সকলের অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থেকে যায় তাহলে আজ না হোক তো কাল শাসক দলের ভোট ব্যাঙ্ক টান পড়তে বাধ্য।

তাহলে আসল কথাটা হল এই যে, বিশ্বায়ণ চলুক, বাজার অর্থনীতি চলুক, কারণ সারা পৃথিবী যেদিকে চলেছে তার উল্টোপথেহাঁটাটা মূর্খতা। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের মত গরিব দেশে রাষ্ট্রকে ও তার দায়িত্ব পালন করতে হবে বৈকি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, গ্রামের শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা, সার্বিক পরিকাঠামো এ-সবই রাষ্ট্রকে দায়িত্ব নিয়ে গড়ে তুলতে হবে। নাহলে বিশ্বায়নের স্বর্ণরথটিও থেমে যাবে, যেহেতু রাষ্ট্র এবং বাজার প্রকৃতপ্রস্তাবে একে অপরের পরিপূরক।